# এই রাজ্যের মানুষ উদার, কিন্তু জবরদস্তি তাঁরা সহ্য করেন না

*জহর সরকার*

পশ্চিমবঙ্গের ২০২১ সালের নির্বাচনের ঐতিহাসিক ফলাফল দেখে আমাদের অনেকের বিশ্বাস হল যে, বাঙালির এখনও লড়ার ক্ষমতা আছে। রাজ্যের নির্বাচকরা ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে আক্রমণাত্মক প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁদের কাছে ওঁর ‘ডবল ইঞ্জিন’ উন্নয়নের টোপের থেকে আত্মসম্মান ও বহুত্বের মূল্য অনেক বেশি। এ রাজ্যে ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর কুড়িটি সফর ও কাঁড়ি কাঁড়ি জনসভার পরেও তাঁর ম্যাজিকে কাজ হল না কেন, তা উপলব্ধি না করেই তাঁর দল বাঙালিদের তথাকথিত উগ্র আঞ্চলিকতাকে দোষ দিল।

Advertisement

Video Player is loading.

Current Time 0:00

Duration 10:03

Remaining Time 10:03

UNIBOTS

এই প্রথম আমাদের নামে নতুন অপবাদ শোনা গেল। শুধু জাতীয় গণমাধ্যমে নয়, আন্তর্জাতিক মিডিয়াতেও। যথেষ্ট ব্যাপক এই প্রচার ছিল সুচিন্তিত ও পূর্বপরিকল্পিত। জাতীয় দলের নেতারা সরাসরি না বললেও কানাঘুষো প্রবল হল যে, বাঙালিদের ওস্কানো হচ্ছে সঙ্কীর্ণতার পথে। বেশ কয়েকটি কাগজে আর বৈদ্যুতিন মিডিয়াতে আমাদের এমনকি বোঝাতেও হল যে, পুরো ব্যাপারটি ডাহা মিথ্যে। আসল সত্য: কেন্দ্রের শাসক দল এই রাজ্যে নিজেদের দলের নেতাদের একেবারে গুরুত্ব দেয়নি।

এই প্রচার চালাচ্ছিলেন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নেতারা, হিন্দি ভাষায়, বেশ একটা ঔপনিবেশিক ভঙ্গিমায়। হাত মিলিয়েছিল পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনী। গত কয়েক বছর ধরে বাংলার মানুষ অবাক হয়ে দেখেছেন মোদী-শাহের দলের আয়োজনে মোটরবাইকে সওয়ার তরোয়ালবাহী বলবান পুরুষের বিক্রম, যারা শ্রীরাম আর শ্রীহনুমানকে পদাসীন করার লাগাতার চেষ্টা চালায়। অনেকের মনে আছে কয়েক দশক পূর্বে বেশ কিছু বাঙালি কত সহজে ‘জয় সন্তোষী মা’কে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের কোনও লাঠি-তরবারি দেখাতে হয়নি। নেতাজি-রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রচারকদের অর্বাচীন মন্তব্যের কথা তুলে সময় নষ্ট না-ই করলাম।

বাংলার মানুষের সুস্পষ্ট রায় দেখে বোঝা যায় যে, চুপচাপ সহ্য করলেও তাঁরা অনেক আগে থেকেই মন ঠিক করে ফেলেছিলেন। এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁদের ক্ষোভ বা পছন্দ কিছুই প্রকাশ করেননি, ফলে শেষ দিন অবধি মিডিয়া এবং জনমত-বিশেষজ্ঞরা বিশেষ আঁচও পাননি। ক্রমাগত শোনা যাচ্ছিল, ব্যবধান যা-ই হোক, এ-বার বিজেপিই নিশ্চিত জিতবে। বিশেষজ্ঞরা ধরতেই পারেননি, দু'টি বিষয়ে বাঙালিরা কোনও আপস করবেন না। এক, তাঁদের বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি আবেগ; আর দুই, বাংলার বহুত্ববাদী ঐতিহ্য। এই দু'টির প্রতি লাগাতার অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য আর চাপা আক্রমণ তাঁদের কাছে অসহ্য, ভোটের দিনই প্রমাণ মিলল।

বাঙালি যে মনে-প্রাণে একেবারেই সঙ্কীর্ণ নয়, তা দেখা গেল অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও। যেমন, দীপাবলির ঋতুতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় রীতি অনুযায়ী ধনতেরাস পরব পালন এক শ্রেণির বাঙালির কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, আমাদের মৌলিক বিশ্বাস বা প্রথা বদলে যাচ্ছে। যাঁদের আমরা সাধারণত হিন্দিভাষী বলি তাঁদের কাছে 'দিওয়ালি' হল পাঁচ দিনের, লক্ষ্মী ও কৃষ্ণের উজ্জ্বলময় পূজা। আমাদের কালীপূজা কিন্তু এক ঘোর অমাবস্যা রাত্রির অনুষ্ঠানই থেকে গেল। আমরা ওঁদের আগেই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো সেরে নিই, দুর্গাপুজোর ঠিক সাত দিন পর। কিন্তু এত ঘটা করে সে পুজো হয় না, হয় ছোট করে, শান্ত ভাবে। দেওয়ালির সময় অবশ্য আমাদের কিছু পরিবার দীপান্বিতা লক্ষ্মীর পূজা করে থাকে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে দেওয়ালি শুরু হয় কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর তিথিতে এই ধনতেরাস দিয়ে। ধন ও ঐশ্বর্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে ধনতেরাসের দিন নতুন বাসন, অলঙ্কার কেনার একটা বাধ্যবাধকতা আছে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের সভ্যতার মধ্যে বেশ কিছু বিশেষ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা সময়ের সঙ্গে ওঁদের অনেক প্রথা গ্রহণ করছি। যদিও চলাচলটি এখনও প্রায় একতরফা, কিন্তু আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বাংলা ও বাঙালির অবদানকে সারা ভারত এখনও যে যথেষ্ট সম্মান দেয় এবং মনে রাখে, তা-ই বা কম কী।

ভারতের সংস্কৃতায়ন বা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের চাপানো বা আরোপণের তত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনায় না গিয়েও আমরা দেখতে পাই, কত রকমের মিলও আছে। যেমন ধনতেরাসের পৌরাণিক কাহিনিটি অনেকটা আমাদের মনসামঙ্গলের গল্পের মতো। পুরাণ বলে, হিমরাজার সন্তানের কপালে একটি অভিশাপ ছিল। সে নাকি বিয়ের চতুর্থ রাতে ঘুমিয়ে পড়লেই মারা যাবে। আর এই রাতটা পড়েছিল ধনতেরাসের তিথিতে। পতিব্রতা স্ত্রী ঘরের বাইরে তার যত অলঙ্কার ছিল সব এক ঢিপি করে রাখল। গভীর রাতে যখন যমরাজ সাপের রূপ ধারণ করে এলেন, তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওই গয়নার স্তূপ আর জ্বলজ্বল করা মণিরত্ন দেখে। তিনি আর কক্ষে প্রবেশ করলেন না, বরং সারা রাত হিমরাজার পুত্রবধূর সহস্র কাহিনি শুনে কাটালেন আর ভোরে একাই ফিরে গেলেন। তাই এই ধনতেরাসের রাতে যত সোনা আর ধনরত্ন জোগাড় করা যায় ততই মঙ্গল আর শুভ।

আসল সত্যটি হল, হিন্দু ধর্ম ধন অর্জন করাকে একটি বড় গুণ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় আর চায় যে এর একটি অংশ ব্রাহ্মণ, মন্দির ও পূজার্চনায় খরচ হোক। এই উৎসবের সময় ব্রাহ্মণ, রাজা, জমিদারকে শস্য ও বিভিন্ন উপহার দেওয়ার রীতি ছিল। ধর্মীয় আচারে এই রীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে এই কারণে, যাতে ব্যবসায়ী, কৃষক এবং সাধারণ গৃহস্থরা ঈশ্বর ও শাসককে তাঁদের প্রাপ্য দিতে না ভোলেন। অনেক অঞ্চলে ব্যবসায়ীরা হালখাতা শুরু করেন এই পুণ্য লগ্নে। দেওয়ালি এবং ধনতেরাসে গয়না আর বাসনপত্র কেনার যুক্তি হল— ব্যবসায়ী ও কারিগররা যেন নতুন ফসল থেকে প্রাপ্য আয়ের একটা অংশ পান। সেই জন্যই এই উপহার ও কেনাকাটার রীতি। এমনকি এই সময় জুয়া খেলারও অনুমতি মেলে। ধর্ম যেখানে লক্ষ্মী, কুবের ও গণেশের চিত্রের সামনে 'শুভ লাভ' লিখে মুনাফা পুজো করে সেখানে এতে অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাই অক্ষয় তৃতীয়া আর ধন ত্রয়োদশীর মতন অনুষ্ঠানে ক্রয় ও দানের বিধি আছে, বা ছিল। এতে সমাজের মধ্যে ধনের সঞ্চালন হয়, যা সকলের পক্ষেই লাভজনক। চাহিদা, উৎপাদন, বিক্রয় ও সরবরাহ বৃদ্ধি  পলে সম্পূর্ণ অর্থনীতির উপকার হয়।

শুধু লক্ষ্মী বা দেওয়ালির ব্যাপারে নয়, বাঙালি অনেক ব্যাপারেই আলাদা। যেমন, তাঁরা পিতৃপক্ষ পালন করেন মহালয়ার দিন, অথচ ভারতের অন্যান্য জায়গায় পিতৃপক্ষ পালিত হয় দীপাবলির সময়। আবার, বাঙালি কারিগররা তাঁদের যন্ত্রপাতির পূজো করে ফেলেন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বিশ্বকর্মা পূজোর দিন, অথচ বাকি রাজ্যে দুর্গাপুজোর দশমী কিংবা দেওয়ালির সময় যন্ত্রের পূজো হয়। নবরাত্রির সময় ভারতের অনেকেই নিয়মিত ব্রত পালন করেন এবং হয় সম্পূর্ণ উপোস করেন বা নিরামিষ খাবার খান, প্রচুর বাধানিষেধও পালন করেন। সাধারণ বাঙালি এ-সবের ধার ধারেন না, আর ন'দিনের মাত্র শেষ চারটিতেই পূজা করেন, তা-ও মাছ-মাংস খেয়ে । কিন্তু যত দিন যাচ্ছে বাঙালিরা ক্রমশ বেশ কয়েকটি সর্বভারতীয় রীতি মানতে শুরু করেছেন। যেমন গণেশ বা হনুমানের পুজো করা। হিন্দি সিনেমার প্রভাবে বাঙালি বিয়ের আগের দিন এখন আমরাও নাচগানের 'সঙ্গীত' নামক অনুষ্ঠানও করছি। এখানে এখন কিছু বিবাহিত মহিলা করওয়া চৌথ-এর ব্রত পালন শুরু করেছেন। বিশ্বায়নের যুগে অনেকেই উঠে পড়ে লেগেছেন ঐশ্বর্যের পুজোয়। আগে যাঁরা বিপ্লব-টিপ্লব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন তাঁদের ও সবের জন্যে আর সময় নেই ।

আপাতদৃষ্টিতে এ-সব খানিক পরস্পরবিরোধী মনে হলেও এর ব্যাখ্যা কিন্তু তত জটিল নয়। সেই নবজাগরণের যুগ থেকে বাঙালিরা যথেষ্ট সংস্কারমুক্ত, কোনও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু বহিরাগতরা যদি গায়ের জোরে কিছু চাপাতে চায়, তাঁরা রুখে দাঁড়ান। সিনেমা টিভিতে যে দুনিয়াকে দেখানো হয় সেটি হিন্দিতে হলেও অনেকখানি এক কৃত্রিম সর্বভারতীয় চিত্র বা সংস্কৃতি। এর মধ্যে মিশে গেছে মহারাষ্ট্রের গণেশ পূজা, পঞ্জাবিদের নাচ ও করওয়া চৌথ, বলিউডের সম্পূর্ণ নিজেদের আবিষ্কৃত লাফালাফি নৃত্য আর বেশ কয়েক কিলো পশ্চিমি সভ্যতা। হিন্দি ডায়ালগ বা গানের বিরুদ্ধে এখন আর তেমন কোনও বাধা নেই। কিন্তু হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে বাঙালি মানবে না। এ তার সঙ্কীর্ণতা নয়, আত্মমর্যাদা।